৪ : আবেগপ্রবন সাম্রাজ্যবাদ!

স্টীফেন শ্যালোমের প্রথম শাস্তি!

অনেক আমেরিকাপ্রেমী মনে করেন, আমেরিকা আর্দশ ছারা যুদ্ধে নামে না-বিশ্ব পরিত্রাতা আর কি! ক্যাপিটল হিলে এই শ্রেনীর এক বিখ্যাত রাস্ট্র বিজ্ঞানী হানস মরগেনথাও! তিনি লিখছেন, ঈশ্বর তুল্য আমেরিকার বিদেশ নীতির একটাই সমস্যা- বড় বেশী আর্দশবাদী। মানবপ্রেমমুখী। চৈতন্যপ্রেমে বিভোর হয়ে ১৮৯৮ সালে ফিলিপিনোদের সভ্য করতে আমেরিকা প্রথম বিদেশের মাটিতে পা রাখে। সেই ট্রাডিশন আজো চলছে। ইরাকীদের গনতন্ত্র শেখাচ্ছে এখন!

১৮৯৮ সালেই ফিরি। প্রেসিডেন্ট তখন উইলিয়াম ম্যাকেনলি। ফিলিপিনে সেনা পাঠনোর আগে, কিছু এপিস্কোপাল মিশনারীরা দেখা করতে এল। ম্যাকেনলী যীশুপ্রেমে গদগদ করতে করতে বললেন —সেনেটে সবাই প্রশ্ন করছে ফিলিপিনসে আবার সৈন্য কেন? বড়ই সৌভাগ্য আমার যীশু স্বপ্নে দেখা দিয়ে সে দ্বিধা কাটিয়ে দিলেন। ফিলিপিনসে যীশুপ্রেমে সেখাবে আমার সৈন্যরা!

মিশনারীরা জানালেন ফিলিপিনসের ৯০% মানুষ খ্রীস্টান। ম্যাকেনলি বললেন বটে। বৃটেন, ফ্রান্সের এত শত উপনিবেশ, আমার একটাও না হলে চলে। মিলিটারীতে আমরাই কম কিসে? স্টাটাস বলে কথা! আগেকার বাঙালী বাবুদের স্টাটাস ঠিক হতো তার রক্ষিতার সংখ্যায় এবং সৌন্দর্য্যে।১৮৯৮ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্লাবে স্টাটাস সিমবল ছিল, কার কটা কলোনী আছে। এই জন্য স্টীফেন শালোম বলছেন, ম্যাকেনলির ঈশ্বর বোধ হয় আমেরিকান, ডলার বোঝেন। তাই বৃটেন আর ফ্রান্সের সাথে বানিজ্য যুদ্ধে নেমে ফিলিপিনোদের যীশুপ্রেম শেখাতে চান। প্রেম শেখাতে প্রায় দশ লক্ষ্য ফিলিপিনোদের মারতে হয়ে ছিল, যারা আদপেই খ্রীস্টান ছিলেন।

আমি আমেরিকান আদর্শবাদের আরো তিন উদাহরন দিই।

অনেকের ধারণা আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিত্রাতা। এ রকম একটা ডিবেট ইফোরামে চলছিল বটে। আমেরিকার আদর্শবাদের ভর ং অনেক ভাবেই দেখানো যায়, আমি শুধু দেখাবো, আমেরিকার মানবপ্রেম কি ভাবে ইহুদী নিধনে জার্মানীকে পরোক্ষ ভাবে ইন্ধন যুগিয়ে ছিল।

১৯৩৩ সালে তৃতীয় রাইখ তৈরী হওয়ার পর, ইহুদীরা জার্মানী ছেরে পালাতে থাকে। একটা সত্য এখানে জানা দরকার। হিটলারের প্রথম লক্ষ্য ছিল, ইহুদী বিতড়ন। তাদের মেরে ফেলা নয়। কিন্তু যাবে কোথায়? ইউরোপের কোন দেশ তাদের নিতে রাজী হল না। রাজী ছিল শুধু কিউবা। ইহুদীদের অনেক আশা ছিল আমেরিকা তাদের নিতে রাজী হবে! ইহুদী রিফিউজি সমস্যা নিয়ে আমেরিকা এবং জার্মানীর বৈঠক হয়। নীটফল, আমেরিকা একটিও ইহুদী আপদদের নিতে রাজী নয়।

গল্প এখানেই শেষ হয় নি। অসস্ট্রেজ কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্পে সব চেয়ে বেশী ইহুদী মারা গেছে। অধিকাংশ নিধন হয়েছে ১৯৪৪ সালের শেষ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে। ১৯৪৪ এর জুনে, আমেরিকার সামনে সুযোগ আসে অসস্ট্রীজকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করার। আমেরিকান ইহুদীরা চাপ দিতে থাকে অসস্ট্রীজ বোম্বিং এর জন্য। ইহুদীপ্রেমী জেনারেল ম্যাকলয় জানালেন, তাও কি হয়। আমরা অস্ট্রীজ বোম্বিং করলে, ইহুদীদের উপর অত্যাচার বেড়ে যাবে না?জার্মানী তাদের জানিয়েছে কোন ইহুদী তারা মারছে না। আমি আমেরিকাকে জার্মানীর পাঠানো ডকুমেন্ট তুলে দিলাম।

চিত্র১ : জার্মানীর পাঠানো চিঠি

চিত্র২ : অশ্বিজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।

ফাইনাল সলুসন অনুযায়ী দলে দলে ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে মারা হচ্ছে তখন। গোটা পৃথিবী জানে, আমেরিকা জানে না! আসলে অনেক জেনারেলই, ইহুদী বিদ্বেশী ছিলেন। জার্মানীর আর্য কেন্দ্রিক দুর্বলতা, আমেরিকার কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যেও ছিল, আজো আছে। আমি বর্ণবিদ্বেশের উপর যখন লিখব, তখন আলোকপাত করব। ইরাক আক্রমনের পেছনেও সুপ্ত আর্য্যচেতনা কাজ করেছে।

দ্বিতীয় উদাহরন দিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। বাংলাদেশে খানসেনাদের নৃসংস গনহত্যাকান্ড এবং গনধর্ষন তখন পৃথিবীকে আলোড়িত করছে। শ্রীমতি গান্ধী, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে সবাইকে সে কথা জানাচ্ছেন। চাপে পরল আমেরিকা। হেনরী কিসিঞ্জার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকলেন। এই ভদ্রলোক বৈঠক শেষে অম্লান বদনে জানালেন, সবই রাশিয়ার প্রচার। আমরা পাকিস্থানকে বলে দিয়েছি না, আমেরিকার সাথে আছো, কোন অত্যাচার চলবে না। পাক সেনারা যাদের মারছে তারা আসলে, রাশিয়ার গুপ্তচর। মুক্তিবাহিনী রাশিয়া-ইন্ডিয়ার ফ্রন্ট! ধর্ষন হচ্ছে গিয়ে রাশিয়ার প্রচার! সেখানেই কি শেষ, পাকিস্থানকে উদ্ধার করতে নৌবাহিনী পাঠালেন কিসিঞ্জার!ভারতীয় এবং বাংলাদেশীদের বেজন্মা বলেছিলেন। সেটা কি খানসেনারা গৌরবর্ণের বলে? বর্ণ বিদ্বেশের এখানেও ভূমিকা ছিল বলে রাস্ট্র-মনস্তত্য বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন।

চিত্র৩ : বাংলাদেশ খানসেনাদের গনহত্যা

চিত্র৪ : ১৯৭১ –বাংলাদেশের রাস্তায় স্তূপ করা লাশ

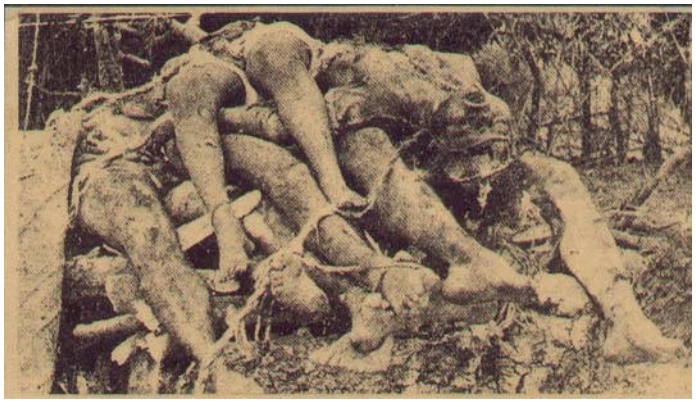

চিত্র৫: মৃতের পাহাড়, বাংলাদেশ ১৯৭১

চিত্র৬ : বাচ্চাদেরও রেহায় দেয়নি খান সেনারা!

চিত্র৭ : ঢাকার রাস্তায় মৃতদেহ গড়াচ্ছে

তৃতীয় উদাহরন-১৯৯৪ সালের রাওন্ডা। রাওন্ডার প্রেসিডেন্ট হাবিরিয়ামার প্লেনকে কীগালীর কাছে গুলি করে নামায় RPF। হুতু মিলিশিয়া ১০০ দিনের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ টুসি উপজাতিকে গনহত্যা করে। এমন হত্যালীলা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর আর কেউ দেখে নি। আমেরিকার ভূমিকা কি? প্রথমেই বেলজিয়াম, ফ্রান্সের সাথে সিভিলিয়ান আমেরিকানদের সরানো হল। রাওন্ডার রাজধানী কিগালীতে রাস্ট্রপুঞ্জের ২৫০০ সেনা মোতায়েন ছিল। তাদের সাহায্য দরকার। নিউইয়ার্কে রাওন্ডা থেকে তারবার্তা আসে, আরো সেনা পাঠান, নইলে এই মানবনিধন যজ্ঞ থামানো যাবে না। ক্লিনটন নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকলেন। এখানে নীটফল? সমস্ত আমেরিকান সৈন্যদের সরিয়ে দিতে বললেন ক্লিনটন। শেষ পর্যন্ত রফা করে ২৭০ জনকে রাখতে দিলেন-একটাই শর্ত। কোন ব্যাপারে নাক গলাবে না। টুসীরা মরছেতো আমাদের কি?

শুধু তাই নয় সমস্ত রাস্ট্রদূতদের নোট পাঠানো হয় যাতে তারা রাওন্ডার ব্যাপারে গনহত্যা (genocide) কথাটি ভুলেও মুখে না আনে। কেননা পৃথিবীর যেকোন দেশেই গনহত্যা হলে সংবিধান অনুসারে আমেরিকা সেনা পাঠাতে বাধ্য। রাওন্ডার বিভৎস হত্যালীলা চাপা থাকল না। চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৫০০০ সেনা পাঠানো হবে। তবে আমেরিকা পাঠাবে না, সাহায্য করবে। ভালো কথা। আফ্রিকার কিছু দরিদ্র দেশ সেনা পাঠাতে রাজী হয়। তারা আমেরিকার কাছে কিছু অস্ত্র আর আর্মি ভেহিকল সাহায্য চায়। আমেরিকা রাজী-তবে ফেল করি, মাখতেল! হ্যা একটু কমে দেওয়া হবে! এই দরদাম চলে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ, যার মধ্যে মারা যায় প্রায় দুই লক্ষ টুসি।

হটাৎই ফ্রান্স বলে তারা সৈন্য পাঠাতে রাজী। ফ্রান্স আদপে হুতু চরমপন্থী সরকারের সঙ্গী অনেকদিনের। অনেকটা বিড়াল বলে মাছ পাহারা দেবে টাইপের ব্যাপার। সবাই হই হই করছে, আমেরিকা বলে, আমরা আছি না! সে তো তারা নিশ্চয় আছে। তাই গনহত্যাকারী হুতু মিলিশিয়ার লোকজন ফ্রান্সে পালাতে সক্ষম হয়! আজো তাদের বিচার হল না!

চিত্র৮ : রাণ্ডান্ডার গনহত্যা

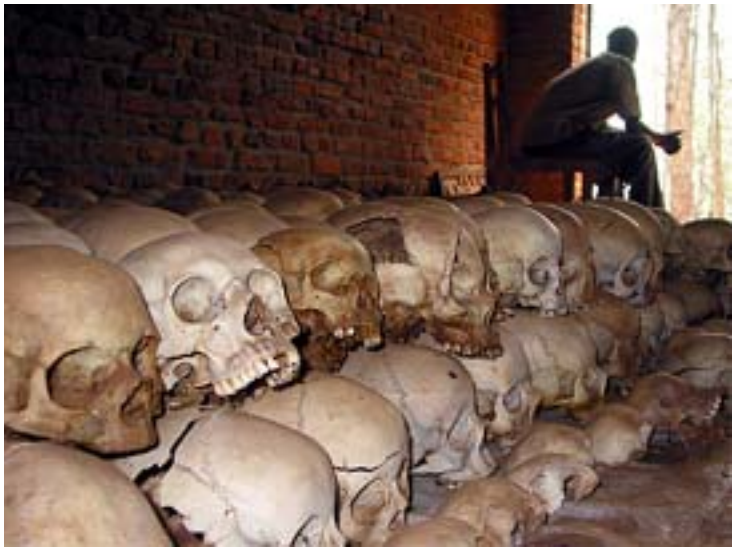

চিত্র৯ : টুসীদের হাজারো মাথার খুলিকেও আমেরিকান ডিপ্লোমাসী গনহত্যা বলে না!

১৯৭০ সালে কুর্দদের অস্ত্র সাহায্য দিত আমেরিকা। যাতে ইরাকের আমেরিকা বৈরী বাথ পার্টি RCC বাগে আসে। শাহর ইরান হয়ে অস্ত্র আসত। ১৯৭৫ সালে ইরাক-ইরান চুক্তি এবং কুর্দদের অস্ত্র সাহায্য বন্ধ হয়। কুর্দ নিধন যজ্ঞ শুরু করেন ইরাক প্রেসিডেন্ট আল বকর। কুর্দরা আমেরিকান সাহায্যর জন্য ত্রাহি ত্রাহি রব ছারছে। নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকে সেনা পাঠাতে চাইল। যুক্তি এই যে, কুর্দদের এভাবে পেছন থেকে ছুরি মারা ঠিক নয়- ক্রেডিবিলিটির প্রশ্ন। হেনরী কিসিঞ্জার বললেন, পাগল! আমরা মিশনারী নাকি? গুপ্ত কার্য কলাপ আর মিশনারী কার্যকলাপে পার্থক্য থাকবে না?

শ্যালোম একেই বলছেন, আবেগপ্রবন সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ দেশকে বোঝাও, মানবতার খাতিরে প্রতিঅজ্ঞা কাঁদে মোর। দেশের টিভি, পেপার সেই কাজ করুক।

আমেরিকাকে শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঠগ বাঁচতে গা উজার হবে। ৯৯% ভারতীয় জানে, তারা সাধু, যতদোষ পাকিস্থানের। পাকিস্থান বলে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতীয় মদতপুস্ট! তারা সাধু। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও এক। এ ওকে বলে যত দোষ নন্দঘোষ! দেশের মিডিয়াও সেটাই প্রচার করে। দেশপ্রেমতো এক ধরনের পন্যই!

সাধে কি আর শ্যালম বলছেন, স্বার্থশুন্য বিদেশনীতি আসলে সোনার পাথরবাটি!

[চলবে]